আমি, আমার অভিনয় জীবন এবং ঋত্বিকদা

সত্যব্রত চট্টোপাধ্যায়

সে সময় টালিগঞ্জে আট টাকা ভাড়ার একখানা টালির ঘরে থাকি আমরা। আমরা তিন ভাই, ছোট এক বোন আর মা। আমাদের সবার চেয়ে বড় বোনের অল্প বয়সেই বিয়ে হয়ে গেছে। আমার বাবা মারা যাবার পর থেকেই সে থাকতো মামাবাড়িতে।

এই একখানা ঘরেই আমাদের হাসি কান্না, রান্না - বান্না খাওয়া শোয়া পড়তে বসা। আমার মা শ্যামবাজারের দিকে একটা স্কুলে পড়াতো। মা - ই তখন একমাত্র রোজগেরে আমাদের সংসারে। সামান্য মাইনে, ফলে প্রচন্ড অভাবের মধ্যে আমাদের দিন কাটতো।

খুব ভোরে উঠেই মা উনুনে ভাতে ভাত সেদ্ধ করে কখন যে বেরিয়ে যেতো খেয়ে, না খেয়েই —খেয়ালই করতাম না। আমরা আমাদের সকালের নিত্যকার বরাদ্দ দু পয়সার ছোলা মুড়ি কিনে এনে খেতে বসতাম। খাওয়া হলে দাদা ছোট ভাইকে নিয়ে পড়তে বসতো। আমি তখন পড়তাম না। সালকিয়াতে থাকতে আমার মেনিনজাইটিস্ হয়েছিলো, তাই ডাক্তারের বারণ ছিলো সে সময়। লেখাপড়া নেই। আমি মহানন্দে ড্যাং গুলি খেলি আর গান গাই। কানন দেবীর গান। কলের গানে শুনে শুনে বেশ কয়েকটা তুলে ফেলেছি।

ভাড়া বাকি পড়ায় সালকিয়ার বাড়ি থেকে উৎখাত হয়ে মধ্য কলকাতার ডিকসন লেনে। জ্ঞাতি সম্পর্কের আশ্রয়ে কয়েকটা দিন। সেখান থেকে এই টালিগঞ্জে। সালকিয়াতে আমি আর দাদা একটা মিউনিসিপ্যাল স্কুলে পড়তাম। সেখান থেকে উৎখাত হয়ে এসে এখন পর্যন্ত্য আর...

তাতে কি। আমার ভারি মজা। মাস্টারমশাইয়ের বেত নাই, মায়ের কিল চড় নাই, তাই আদি গঙ্গার ঘাটে বসে আমি মহা সুখে গান গাই। কিছু শ্রোতা যে জোটে না, এমন নয়। তারপর কোন একদিন কোন এক সময় একজন ভদ্রলোক কাছে এসে আমাকে বললো, ‘‘কানন দেবীর গান তোমার গলায় দাণ মানায়। উনি যদি শুনতে পেতেন। তোমাকে নিয়ে যাবো খুব একটা সুন্দর জায়গায়। তুমিসেখানে গান শোনাবে, যাবে?’’

‘কোথায় ?

‘ইন্দ্রপুরীতে। সবাই সেখানে যেতে পারে না। ঢুকতেই পারে না’

‘তা হলে আমি কি করে ঢুকবো!’

‘তুমি তো আমার সঙ্গে যাবে। তার আগে বলতো বাড়িতে কাকে বলতে হবে তোমাকে নিয়ে যাবার জন্য।’’

আমি সব বললাম।

ইন্দ্রপুরীর প্রবেশ দ্বারে কোনই বাধা পেলাম না। তবুও আমার কেমন জড়সড় ভাব। ভদ্রলোক সেটা লক্ষ্য করেছেন। বললেন, ‘ভয় কি। আমি তো আছি।’

‘‘আমাকে এখানে গান গাইতে হবে, —এক্ষুনি?’’

আমার গলা শুকিয়ে কাঠ।

ভদ্রলোগ বললেন, ‘না আজ গান নয়। পরে একদিন।’ আমি স্বস্তি পেলাম। আমাকে নিয়ে একটা ঘরে ভদ্রলোক ঢুকলেন।

‘‘স্যার এই যে এনেছি।’

কোঁচানো ধুতি, গিলে করা ঢোলা হাতা পাঞ্জাবীতে পরিপাটি এক প্রৌঢ়। রোল্ড গোল্ডের চশমা পরা চোখে সিগারেটে টান দিতে দিতে আমাকে দেখলেন। দেখে বললেন, —চলে যাবে। যাও, একে খাইয়ে দাইয়ে সাজিয়েগুজিয়ে কথাগুলো মুখস্ত করাও। তার কথা মত আমাকে সাজিয়েগুজিয়ে কিছু কথা পাখি পড়া মুখস্ত করানো হলো। তরে পর ইন্দ্রপুরীর যেখানে আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো, সেখানে গিয়ে আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। মুগ্ধ চোখে সবকিছু চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম। রাজা মহারাজাদের বাড়ি তো শুনেছি এমনই হয়। কি সুন্দর সুন্দর মুর্তি, বড় বড় ছবি, দেয়ালে সিংওলা হরিণের মাথা। ঝাড় বাতি পালঙ্ক, আরও নাম না জানা কত কি!...

‘‘এটা তোমার বাড়ি।’’ —চেয়ে দেখলাম, সেই প্রৌঢ় রোল্ড গোল্ডের চমশা পরা ভদ্রলোক।

‘‘তোমার নাম গোপাল। ঐ যে বসে আছেন, উনি তোমার দাদু। — এসো দাদুর কাছে।’’ একজন বৃদ্ধের কাছে আমাকে নিয়ে গেলেন।

‘‘এই আপনার আদরের নাতি। স্কুলের পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফিরছে। যার অপেক্ষায় অস্থির মন নিয়ে আপনি বসে আছেন। গোপাল কাছে আসতেই আপনি ওকে বলবেন...

আর গোপাল, তুমি দাদুকে বলবে...

একে একে অনেক আলো জুলে উঠলো। তারপর বেশ কয়েকবার দাদু আর নাতির কথা বলা চললো।...

‘‘রবীন মাস্টার’’ নামে ছবিটিতে আমার প্রথম অভিনয়। অহীন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে। পরিচালক সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক। নাম জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এরই পরে পরে আরো দুটি ছবিতে কাজ পেলাম। একটির নাম ‘কালের ঘোড়া পরিচালক জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়, অপরটির নাম ‘ওরে যাত্রী’ পরিচালক রাজেন চৌধুরী। ‘ওরে যাত্রী’ ছবিতে উত্তমবাবু অভিনয় করেছিলেন। তখন তিনি উত্তমকুমার নামে পরিচিত ছিলেন না। অন্য কোন নাম ছিলো। পর পর এই তিনটে ছবিতে কাজ করেছিলাম তাদের সঙ্গে। আমার তখন আট বছর বয়স। ‘তারা’ হওয়ার ইচ্ছে জাগার বয়স হয়নি। এসব করে কিছু টাকা পাওয়া গিয়েছিলো। সেই টাকায় ভালো মন্দ খেয়ে ছিলাম বেশ ক’দিন। এই ‘ইচ্ছেটা’ আমাদের সবার মনেই ছিলো। টালিগঞ্জের বাস উঠিয়ে এক সময় চলে এলাম কলকাতার মানিকতলা অঞ্চলে।

একেবারেপুণ্য ভূমিতে এসে গেছি বলা যায়। আমাদের ভাড়া বাড়ির প্রায় কাছাকাছি ডি. এল. রায়ের বাড়ি। কিছুটা দূরে দূরে রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর আর স্বামী বিবেকানন্দের পৈত্রিক বাড়ী।

টালিগঞ্জ থেকে শ্যামবাজার যাতায়াতে মায়ের খুব কষ্ট হতো বলেই এই বাসা বদল।

সিনেমা করার কাজ আমার চুকে বুকে গেছে। পড়াশুনায় বেশ পেছিয়ে গেছি। আগ্রহ কম, নইলে এতটা পেছোতাম না। আমাদের পাড়া থেকে কিছুটা দূরে হরতুকি বাগানে ইউথ এ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে কি করে যেন যোগাযোগ হয়েছিলো মায়ের। সেখানে কয়েকজন শিক্ষিত যুবক রোজ সন্ধেবেলা গরীব ছাত্রদের পড়াতেন বিনা পারিশ্রমিকে। মা আমাকে সেখানে ভর্তি করে দিলো। গিয়ে দেখলাম ওখানে দিন ভর খেটে খাওয়া কিছু ছাত্রও পড়তে আসে। ওদের মত আমারো কিছু রোজগার করে পড়াশুনা করা উচিত— এই সত্যিটা এগারো বছর বয়সেই বুঝে গিয়েছিলাম। না হলে যে চলবে না আমাদের সংসার। কাজ চাই, যে কোন কাজ। মা যে আর আমাদের খাবার যোগাতে পারছে না। অসুস্থ হয়ে পড়ছে মাঝে মাঝে। নকুল্যের কবিরাজ মশায়ের ওষুধ এনে খায়। বেশ বুঝি, এবার দাদার সঙ্গে আমাকেও কাজে লাগতে হবে।

মন্বন্তরে মারিনি আমরা সেতো মায়ের জন্যে। ছেলে মেয়ে মানুষ করার প্রবল ইচ্ছা নিয়ে প্রমত্তা পদ্মা পাড়ি দিয়ে সেই পূর্ব বাংলার গ্রাম থেকে এই শহরে ক্লাশ এইট - এর বিদ্যা নিয়ে মা এসেছিলো। সেই থেকে আমাদের বাঁচবার, লেখাপড়া শেখানোর অবিরাম চেষ্টা চলেছে। এ্যাসোসিয়েশনে পড়া শেষে সহপাঠীদের সঙ্গে কাজের আলোচনা করি। ছোট ছোট ড্রিল আর লেদ মেশিনের কারখানায় ওরা যেখানে কাজ করে কিংবা ছাপাখানায় কম্পোজিটারের কাজে। কিংবা কোন চায়ের দোকানে, রেস্তোরাঁয় ... মোটকথা কাজ একটা জোটাতেই হবে আমাকে।

যে তিনটা ছবিতে কাজ করেছিলাম— তার একটা নাম 'কালো ঘোড়া' পূর্ণশ্রীতে মুক্তি পেয়েছিলো। তেমন চলেনি, ভাগ্যিস চলেনি। বেশি দিন চললে হয়তো কিছু দর্শক আমাকে চিনে ফেলতো। তখন এ সব কাজ করা মুস্কিল হতো।

কাজের চেষ্টায় বেরোবো ঠিক করছি, ঠিক সেই সময় হঠাৎ - ই আবার অভিনয়ের ডাক এলো চিত্র পরিচালক অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে । সুবোধ পাল নামে এক ভদ্রলোক একদিন সিঁথির মোড়ে ন্যাশনাল সাউন্ডস্টুডিওতে আমাকে নিয়ে গেলেন। অর্ধেন্দুবাবু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমাকে কিছুক্ষণ দেখলেন। অভিভাবককে জানতে চাইলেন। কোন স্কুলে পড়ি, কোন ক্লাশ, বয়স কত, মুখে আঙুল দিয়ে সিটি বাজাতে পারি কিনা, গাছে উঠতে পারো কি না, বিড়ি টানতে পারো কিনা। — আমি কিছু সত্যি, অনেকটা মিথ্যায় জবাব দিলাম। কিছু সংলাপ বলানোর শেষে একটু আধটু গান গাইতে পারি কিনা। গানটা পারি শুনে তখুনি শুনতে চাইলেন। শুনে খুশি হয়েছেন মনে হলো। স্টুড়িওতে খাওয়া দাওয়ার পরে বাড়ি ফেরার পথে সুবোধবাবু বললেন, 'বড় ভালো পাট'। কাজটা মনে হয় তোমার হয়ে যাবে। মন দিয়ে কোর। ভালো করতে পারলে নাম হবে খুব', সুবোধবাবুর কাছেই জানলাম, যে ছবিটি হতে যাচ্ছে তার নাম সন্দীপন পাঠশালা।' তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী। ছবির সুরকার হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। শুনে মনটা খুশিতে ভরে উঠলো । এতদিনতাঁর গান শুনেছি, এবার নিশ্চয়ই কাছে থেকে দেখতে পাবো। সুবোধবাবুর কাছে জানতে চাইলাম সে কথা। বললেন, 'নিশ্চয়ই দেখতোবে। তুমি বুঝি খুব হেমন্তবাবুর ভক্ত?'

বললাম, 'খুব ...খুব।'

শুটিং -এর প্রথম দিন তোরঙ্গ থেকে তুলে রাখা জামা প্যান্ট বেরোলো। পায়ে কেডস্ জোড়া পরে প্রস্তুত হয়ে গাড়ির অপেক্ষায় ছিলাম। কিছুক্ষণ পরে ষ্টুডিওর গাড়ি সদর দরজায় এসে হর্ন বাজালো। বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠলাম। গাড়িতে আরো কয়েকজনশিল্পী ছিলো তাদের তো আমি চিনতাম না।

ষ্টুডিও পৌঁছোতে অর্ধেন্দুবাবু সাজঘরে নিয়ে যেতে বললেন আমাদের। কিছুক্ষণ বাদে সাজঘর থেকে আবার অর্ধেন্দুবাবুর কাছে হাজির করানো হলো। আমার পরনে তখন খাটো ধুতি হাফ হাতা ফতুয়া, খালি পা। আমাকে কাছে টেনে জিজ্ঞেস করলেন,' তোমার নাম কি?' নাম বললাম। উনি বললেন, 'না। তোমার নাম 'অকু'। চাষির ছেলে, গাঁয়ের সব থেকে বখা ছেলে এ কথা অনেকেই বলে। পড়ে না, কিন্তু পাঠশালায় রোজই আসে। পাঠশালাকে খুব ভালোবাসে। পণ্ডিত মশায়কে যদি কেউ গাল মন্দ করে কিছুতেই সইতে পারে না অকু। পাঠশালার যারা ক্ষতি করতে চায়, পাঠশালা তুলে দিতে চায়, তাদের গাল দেয়, সিটি বাজায়, নানা অংগভঙ্গি করে, বিড়ি টানে সেই সব লোকেদের মুখের ওপর। এই 'অকুই' আবার ভালো গান করতে পারে। সহপাঠীদের নিয়ে ড্রিল করে, দৌড়োয়, হা-ডু-ডু খেলে। অকু চরিত্র বোঝানোর পরে কিছু সংলাপ বললাম সীতারাম পন্ডিতের সঙ্গে বেশ কয়েক বার তারপরেই হাঁক পাড়লেন 'অল লাইট।' একের পরে এক আলো জ্বলে উঠলো আবার অনেক দিন পরে। সুবোধ পাল মশাইয়ের কথা মনে হলো। 'ভালো করতে পারলে নাম হবে খুব।' আমার বয়েস এগারো।

বেশ বুঝি, নাম হলে ডাক আসবে।

কাজ পেলে টাকা আসবে।...

টাকা এলে কষ্ট থাকবে না।...

অর্ধেন্দুবাবু আবার হাঁক পাড়লেন, কোয়ায়েট্ ইন দ্যা ফ্লোর রেডি আর্টিষ্ট... ষ্টার্ট সাউন্ড। রেকর্ডিং ভ্যান থেকে বলা হলো রানিং। ক্ল্যাপ্স্টিক পড়লো খট্ করে।

অর্ধেন্দুবাবু বললেন, ''এ্যাক্শান!''

ছবির কাজ শেষ হয়ে যথা সময়েই মুক্তির দিন এগিয়ে এলো। ছবি মুক্তির আগে সে সময় প্রেস শো হতো। ছবি দেখতে ভবানীপুরের বিজলিতে আমি আর দাদারা সকাল সকাল পৌঁছে যাই। সেখানে কিছু শিল্পী সাহিত্যিক ছবির কলাকুশলী সাংবাদিক উপস্থিত। সে সময় কাউকেই আমি চিনতাম না। তাদের মাঝেই বসে আমি ছবি দেখি। ছবি শেষ হওয়ার পরে আমাদের তিনজনতে ঘিরেই যত আলোচনা, উচ্ছ্বাস, ভালবাসা। এত প্রশংসা, ভালোবাসা। যা ছিলো আমার কল্পনার অতীত! সুবোধ বাবুর কথা যে এমন অক্ষরে অক্ষরেফলে যাবে তা ভাবতে পারিনি। দিন কয়েক বাদে সন্দীপন পাঠশালা মিনার, বিজলি, ছবিঘরে মুক্তি পায় এবং সিনেমার লোকেরা যে কথাটি বলে, হিট করা তাই হয়।

এর কিছুদিন পরে পরিচালক সত্যেন বোস আমাকে তাঁদের প্রতিষ্ঠানে ডেকে পাঠান। সেখানে প্রাথমিক পরীক্ষায় পরে 'পরিবর্তন' নামের ছবিতে আমাকে নায়ক নির্বাচিত করেন। বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় যে, এই ছবিতেই প্রখ্যাত সুরকার গীতিকার সলিল চৌধুরী প্রথম সংগীত পরিচালনা করেন। পরিবর্তন ছবিতে সেই অর্থে কোন নায়ক নায়িকা নেই। এ ছবি কোন ধরা বাঁধা ছকের ছবি ছিলো না। সারা ছবি জুড়ে শুধু স্কুল পড়ুয়া কিশোর ছাত্ররা। ভারতে সম্ভবত এটিই প্রথম কিশোর চিত্র। এ ছবির সাফল্য নিয়ে অনেকেই সন্দিহান ছিলো, কিন্তু বসুশ্রী, বীণা, আর আলোছায়াতে মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অসম্ভব জনপ্রিয় হয়ে যায়। অভিনয় করে আমার খুবই সুনাম হয়। সে সময় বঙ্গীয় চলচ্চিত্র নাট্য সংঘ নামে সংস্থা আমাকে শ্রেষ্ঠ কিশোর অভিনেতার পুরস্কার দেয়।

এরপর থেকে একের পর এক ছবির কাজ আমার কাছে আসতে থাকে। ছবির কাজের ফাঁকে 'অল ইন্ডিয়া রেডিও'র নাটকেনিয়মিত অভিনয় করতে থাকি। সে সময় রেডিওর সব অনুষ্ঠানই সরাসরি প্রচার হতো। রেকর্ডিং ছিলো না। দু তিন দিন রিহার্সালের পরে তবেই রেডিওতে অভিনয় করতে হতো।

ছবির কাজে, রেডিওর অভিনয়ে তখন সদা ব্যস্ত আমি। আমার সেই কিশোর কালে সাফল্য আমাকে যেন কোথায় অতি দ্রুতনিয়ে যেতে থাকে। নিষেধের বেড়াজালে আটকা পড়ে যাই, নানা ভাবে। ইউথ এ্যাসোসিয়েশনের সহপাঠীরা দূরে সরে যেতে থাকে, বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে গলিতে ক্যাম্বিস বল খেলাও বন্ধ করে দিতে হয়। সেখানে সেখানে না যাওয়া, বেশি কথা না বলা। এ সব আমার পরম শ্রদ্ধেয় কথা সাহিত্যিক প্রযোজক, পরিচালক শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সস্নেহ উপদেশ। অ

ামার কিছু শুভানুধ্যায়ী সে সময় জোটে। তাদের পরামর্শে আমার খাদ্যতালিকায় বাড় বাড়ন্ত ঘটায় মা। চেহারায় চাকচিক্য, পোশাকে রঙিন বাহার, এখন যে খুব জরি। গ্ল্যামারের দুনিয়ার তারকা সমাবেশে মানান সই হতে হয়, এটা যে খুবই দরকার। এ সবের পরে তাদের পরামর্শ বাকি টাকা রাখা হোক কোন ব্যাঙ্কে। মাত্র কট া দিন এদের কথা মত চলেছি। তারই মধ্যে লক্ষ্য করেছি আমার ছোট ভাই বোন দুটো কেমন যেন অচেনা দৃষ্টিতে আমাকে দেখে। যা আমার কাছে অসহ্য মনে হয়েছে। আমি খুব তাড়াতাড়ি পূর্বাবস্থায় ফিরে এসে স্বস্তি পাই।

শ্যামবাজারে আমি আমার পিসিমার বাড়িতে এসে মাঝে মাঝে থাকতাম। সেখানে বিদ্বজ্জনেরা প্রায়ই আমার পিসেমহাশয়ের কাছে আসতেন। সিনেমায় অভিনয়ের জন্যেই কিনা জানি না তাঁদের সংস্পর্শে আসি। নানা কথার শেষে পড়াশুনার কথা উঠতো। তাঁদের উপদেশ, 'পড়াশুনা করতেই হবে।' এ সব শোনার পরে আমার মন অশান্ত হয়ে উঠতো। সত্যিই তো পড়াশুনা ঠিকমত করতে পারছি না। মনে একটা যন্ত্রণা সব সময়ই অনুভব করি। আমার পিসিমা বুঝতো সেটা। পিসিমার পর ামর্শ; প্রাইভেটে না হয় স্কুল ফাইনালটা দিবি। ইচ্ছে থাকলে হবেই। এখন থেকেই টিউটর রেখে আস্তে আস্তে তৈরি হ।'

কিন্তু না, হয় না। ইচ্ছে থাকলেই হয় না। আমার রোজগারের বেশির ভাগ টাকাটা যা ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ের ইচ্ছা নিয়েই ব্যাঙ্কে রেখেছিলো, ব্যাঙ্ক ফেল পড়ায় আমরা একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেলাম। আরো ভালো অভিনয় করার প্রবল ইচ্ছেটা আমার মনে যখন জাগলো, তখনই বুঝতে পারলাম সিনেমা করিয়েরা আমাকে অভিনয়ের সুযোগ দিতে আর আগ্রহ দেখাচ্ছে না। এই অবস্থায় বাড়িতে টিউটর রেখে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার জন্য নিজেকে ধীরে ধীরে তৈরি করার ইচ্ছেটাকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে আমি জয় মা বলেট্রেনে চড়ি। না, আর এ রাজ্যেই থাকবো না। শুধু যাবার আগে জেনে গেলাম; আমার পিসেমশাইয়ের চেষ্টায় কলকাতা কর্পোরেশনের দাদার চাকরি পাওয়ার একমাত্র ভালো খবরটা।

পৌঁছোলাম সোজা মধ্যপ্রদেশের নাগপুরে। আমার খুড়তুতো দাদার মাতুলালয়ে। আমার নাগপুরের মামাতো দুই দাদা ওখানে আমাকে যে কোন একটা কাজ জুটিয়ে দিতে পারবে এই বিশ্বাস নিয়ে। নাগপুরে অণবাবু নামে এক ভদ্রলোক গান বাজনার লোক। ওখানে জনপ্রিয় ও বটে। আমার ভাইরা ওকে আমার গান সম্বন্ধে বলেছে। অণবাবু এসে উপস্থিত। বলে, তোমার গান শুনবো । আমি শোনালাম একদিন। তার পরেই অণবাবুর দলভুক্ত হলাম, গানের রিহার্সালের পর।

মাঝে মাঝেই অণবাবুর দলের সঙ্গে এখানে ওখানে গান গেয়ে ফিরি। কিছু টাকাও হাতে পাই। কয়েক দিনের মধ্যেই বুঝলাম, এ টাকায় আমার হবে না। মাস ম াইনের একটা কাজ চাই। তবেই কিছু মায়ের নামে পাঠাতে পারবো। ছোট মামাতো ভাই ওখানকার নামকরা ফুটবলার। সে কয়েক দিন পরে ছোট একটা ল্যাবে ারেটারিতে মাসিক ষাট টাকা মাইনের একটা কাজ জুটিয়ে ছিল। ল্যাবোরেটারিটা একজন বাঙালি ও আর একজন দক্ষিণীর পার্টনারশিপে চলছে। কাজে লাগার আগে অবশ্য আমার একটা ছোট খাটো ইন্টারভিউ ওরা নিয়েছেন। ইন্দারভিউ শেষে বাঙালি মালিক নাম, ডি.সি দেব - এর শর্ত ছিলো ল্যাবোরেটারিতে প্রয়ে াজনে তার সঙ্গে হিন্দিতে কথা বলতে হবে।

সম্বোধনে 'স্যার' নয়। বাবুতো নই। বলতে হবে 'সাব'।

----এই যেমন... ''দেব সাব নে আ পহুঁছা। 'দেবসাব' নে হুকুম্ দিয়া'' ইত্যাদি।

তাঁর কথা মত রাজি হতেই দেবসাব আমাকে বললেন, কল সে কাম পর লাগু হো যাও। হিন্দির সঙ্গে মারাঠি গান। মারাঠিটা কিছুতেই বাগে আনতে পারি না। অণব াবু উচ্চারণ শেখাতে গলদঘর্ম হয়ে শেষকালে হাল ছাড়েন।

ল্যাবোরেটরির কাজ। মাঝে মাঝে এখানে ওখানে গান গাইতে যাওয়া। এমনি করে বেশ কয়েক মাস কেটে গেলো। মাস মাইনের টাকা মানিঅর্ডার করে মাকে পাঠ াই।

একদিন ওখানকার মামাতো বড় দাদা আমাকে আলাদা থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করতে বলে। এতদিনে আমার সম্বিৎ পেলে। সত্যিই তো একটা চাকুরে মধ্যবিত্ত পরিব ারের বোঝা হয়ে দিব্যি আছি। ছিঃ ছিঃ, কেবল নিজেদের কথাই এতদিন ভেবে এসেছি। বিনে খরচে থাকা খাওয়াতে কোন সঙ্কোচ বোধ হয় নি এতদিন আমার। লজ্জ ায় এবারে যে মাথা কাটা যায়। আলাদা ব্যবস্থা অবিলম্বে আমাকে করতেই হবে। একি করেছি আমি এত দিন।

কি করা যায়! এসব যখন ভাবছি, ঠিক এমন সময় কলকাতা থেকে দাদার চিঠি এলো। চিত্র পরিচালক পশুপতি চট্টোপাধ্যায় তাঁর নতুন প্রযোজনা শরৎচন্দ্রের 'নিস্কৃতি' ছবিতে অভিনয়ের জন্য আমাকে চেয়েছেন। আমি যেন অবিলম্বে কলকাতায় ফিরে যাই। এর আগেও এই পরিচালকের তৈরি শরৎ চন্দ্রের কাহিনী 'স্বামী' ছবিতে আভিনয় করেছিলাম, অভিনেতা প্রদীপকুমারের ছোট বেলার।

প্রয়োজনে ফিরে এসে ল্যাবরেটারির কাজটা যাতে ফিরে পাই, তার জন্য দেবসাব কে বললাম --- সাব, মেরা ভাইকা চিঠি আয়া কলকাত্তা সে। মাতাজি বিমারিমে পড়া হুয়া। ইসি কারণ কুছ দিনোঁকে লিয়ে ছুট্টি দিজিয়ে সাব, ন জানে ক্যায়া হুয়া মাতাজি কো।'

কথা শেষে দু চোখে জল আনতে দেরি করলাম না। দেবসাব মনে কষ্ট বোধ করলেন মনে হলো। কি যেন ভাবলেন কয়েক সেকেন্ড। তারপরে বললেন, ---রোনা মৎ, ছুট্টি মিল জায়েগা। কলকাত্তা জানেকা ট্রেন ফেয়ার হম্ দেঙ্গে। তন্খা ভি পুরা মিল জায়গা তেরেকো।'

মামাবাবু, মামিমা, দুই দাদা আর ছোটদের কাছে চোখের জলে বিদায় নিয়ে কলকাতার ট্রেনে চাপলাম।

আবার কলকাতায়। ...

আবার ষ্টুডিওতে। ...

আবার ফ্লোরে সেটের আলোয়।...

আবার ক্যামেরার সামনে 'নক্ষত্র'দের সঙ্গে অভিনয়ে।... দেবসাবের সঙ্গে অভিনয় করে অভিনয়ের টানেই ফিরে এলাম। পেছনে পড়ে থাকল ল্যাবরেটরির চাকরি। যে কাজের টাকা প্রায় এক বছর ধরে মা ভাইবোনকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করেছে। পেছনে ফেলে এলাম অণবাবু ও তাঁর গান বাজনার শিল্পীদের, এতদিন যারা অ ামার শিল্পী সত্ত্বাকে রক্ষা করেছে। কিন্তু আমি এতটাই অকৃতজ্ঞযে ফিরে আসার আগে ওদের কাছে বিদায় নিয়েও আসিনি।

'নিস্কৃতি' ছবির কাজ শেষ হওয়ার পরে ইচ্ছে হচ্ছিলো আবার নাগপুরে ফিরে যাই। কাজটা হয়তো ফিরে পাবো। অণবাবুর দলে আবার গান করবো। কিন্তু ফিরে গেলাম না।

নিস্কৃতি মুক্তি পেলো। চললো ভালই। কিন্তু অভিনয়ের ডাক আসেনি। এভাবে বেশ কিছুদিন কেটে গেলো। মনে প্রশ্ন জাগে আমি কি ভালো অভিনয় করিনি। পরিচ ালক তো অভিনয় শেষে প্রশংসাই করেছিলেন। ...তবে? বেশ কিছুদিন বসেই কাটালাম। কোথায় আমার ভবিষৎ?, আমি কোন পথে চলবো কে বলে দেবে আম াকে।

'ইন্ডাষ্ট্রিতে লেগে থাকতে পারলে সাফল্য আসতে বাধ্য। তুমি ভালো অভিনেতা এটা প্রমাণিত সত্য।' এ সব আমার প্রিয় এক বন্ধুর উক্তি। বন্ধুটি কবিতা লেখে। দুচে াখে তার কবি হবার স্বপ্ন। যদিও তখনো একটি কবিতাও ছাপা হয় নি কোথাও। পড়াশুনায় ভালো। বিদ্যাসাগর কলেজে পড়ে। আমি বলি, 'কি বলছো লেগে থাকা, সেটি কি ভাবে?' 'যে ভাবেই হোক লেগে থাকতে হবে। চোখেরআড়াল। সবার চোখের সামনে থাকো। আর সময়ের অপেক্ষা করো।'

চিনে বাদাম শেষ হতেই হেদুয়ার বেঞ্চ ছেড়ে বাড়ির দিকে দুজনে রওনা দিলাম।

...'তুমি ভালো অভিনেতা। লেগে থাকে আর সময়ের অপেক্ষা কর।' যদিও সে ফিলম ইন্ডাষ্ট্রির কিছু জানে না। তবুও তার কথা উড়িয়ে দিতে পারলাম না। লেগে থাকার ভাবনাটা মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগলো।

কিছুদিনের মধ্যে উপায় একটা হলো। পরিচালক সুবীর মুখোপাধ্যায় আমাকে তাঁর সহকারী করে নিলেন। বড় অভিনেতা হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে হলাম পরিচালকের সহকারী। এতদিন ক্যামেরার সামনে আলোয় ছিলাম, এবার ক্যামেরার পেছনে অন্ধকারে। যদিও পরিচালক হওয়ার বাসনা আমার একেবারেই ছিলো না, তবুও মনোযোগ সহকারেই সহকারীর কাজ করতে থাকলাম। মাস গেলে হাতেকিছু টাকাতো আসবে যা খুবই দরকার।

কিন্তু সহকারীর কাজ করতে গিয়ে এবার একটা সমস্যায় পড়তে হলো আমাকে। যেটা কখনো আমার আগে মনে হয়নি। পরে বুঝেছিলাম, শিল্পী থেকে সহকারী হয়ে আর ফেরা যায় না পুরোনো জায়গায়।

যাইহোক সে সময়ের কথায় আসি।

আমি ইউনিটে সব থেকে বয়োঃকনিষ্ঠ বলেই কিনা জানি না কোন কোন শিল্পী ও কলাকুশলী আমার কাছে কিছু অন্যায় সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করতে শু করলো। কোন সহকারী পরিচালকের কাছে ঐ ধরনের আবদার করা অন্যায়, অনুচিত বলে মনে হতো আমার। আমি স্পষ্টতঃই বিরক্তি প্রকাশ করতাম। ভাবতাম, ওরা আমার অন্তরের অন্তস্থলে শিল্পীর অভিমানে কেন বার বার এমন আগাত করছে! মনে খুব কষ্ট হতো। এরপর থেকে আমার কাজ নিয়ে কটূক্তি দুর্ব্যবহার যেন বেড়েই চললো। সব কিছু সহ্য করেই কাজ করতে থাকলাম। 'শাপ মোচন' ছবিতে পরিচালক ছোট একটা চরিত্রে আমাকে অভিনয় করার সুযোগ দিলেন। সেই সহেগ সহকারী কাজও চললো। অভিনয় করতে গিয়ে নানা রকম অসুবিধার মধ্যে পড়তে থাকলাম। এতো দিন পরে সে সব লেখার কোন মানে হয় া। ক্রমাগত আমার মনের ওপরে চাপ বাড়তে নানা রকম কৌশল নেওয়া হচ্ছিলো।

এ সব দেখে একসময় পাহাড়ীবাবু (পাহাড়ী সান্যাল) আর সুপ্রভাদির সঙ্গে 'নিরক্ষর' নামের একটি ছবিতে কিছুদিন আগেই অভিনয় করেছিলাম। এই লেখার সুযোগে এ দুজন শিল্পীর আত্মার প্রতি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

এই ছবির পরেও সুধীরবাবুর সঙ্গে আরো একটি ছবিতে সহকারীর কাজ করেছিলাম। লেগে থাকার সহেগ কিছু রোজগার আর সময়ের অপেক্ষা করতেই থাকলাম। বড় অভিনেতা হওয়ার ইচ্ছা নিয়ে।

তারপরে বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। হাতে কোন কাজ নেই। মাঝে মাঝে ষ্টুডিও পাড়ায় যাই। কাজের সন্ধানে। অভিনয়ের সুযোগ আর আশা করি না। সিনে টেকনিশিয়ানস্ এ্যান্ড ওয়ার্কারস্ ইউনিয়নের সভ্য হয়েছি। এখন আমার পেশা ফ্রি - ল্যান্স এ্যাসিস্টেন্ট্ ডিরেকটরের। রেজিট্রেশন নম্বর ৫৩৪৬, কার্ড নম্বর ১৬। পরিচালক হবো, ছবি বানাবো, এসব ভাবি না। এমন অনেকেই ভাবে না। শুধু দুটি ডাল ভাত খেয়ে বেঁচে থাকার জন্য সহকারীর কাজ খোঁজে। কাজ খুঁজতেই টেকনিশিয়ানস ষ্টুডিও তে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি ফ্লোরের বাইরে খোলা জায়গায় মোটর গ্যারেজের 'সেট' - এ পরিচালক ঋত্বিক ঘটক 'অযান্ত্রিক' -এর শুটিং করেছেন। দেখেই আমি চিনতে পেরেছি। 'তথাপি' ছবিতে অভিনয় করার সময় উনি সম্ভবত পরিচালক বিমল রায়ের 'চীফ এ্যাসিসট্যান্ট ডিরেকটর' ছিলেন। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুটিং দেখলাম। ইচ্ছে ছিলো কথা বলার। শুটিং এর বিরতিতে সে সুযোগ এলো। সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই আশর্চ্য উনি আমাকে দেখা মাত্র চিনতে পারলেন!

'কি খবর। কেমন আছিস্?'

'আপনি আমকে চিনতে পেরেছেন?'

কেন পারবো না। এখন কি করছিস?'

ফিলম ইন্ডাষ্ট্রিতে এতদিনের মধ্যে কেউ আমাকে 'তুই' বলে কথা বলেনি। 'তুমি' বলেছে সবাই । মুহূর্তেই মনে হলো যেন আমার খুব কাছের মানুষ।

'আমার কোন কাজ নেই দাদা। বড় অভাবে আছি।'

আবেগে গলা কেঁপে গেলো। কোন রকমে নিজেকে সামলেছি। রেখে ঢেকে চলা, রেখে ঢেকে কথা বলা যে এ লাইনের দস্তুর। সে তুমি যত দুর্দশাতেই থাকো না কেন। এতদিনে সেটা যে আমি শিখে গেছি।— ঋত্বিকদার দিকে চোখ তুলে দেখি, অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে আমার দিকে চেয়ে আছেন। অল্প কিছুক্ষণ পরে বললেন, 'আমার বাড়িতে আয় একদিন। দেখি কি করা যায়। ঠিকানা নিয়ে যাস্।' এই বলে আবার শুটিংয়ে চলে গেলেন।

একদিন সকাল সকালই বাড়িতে গেলাম। দেখা হতেই বললাম, আমি এখন সহকারি পরিচালকের কাজ করছি। অভিনেতা বলে কেউ আর ভাবে না।

'পড়াশুনা'...।

'করি। তবে সেভাবে হয় না। আমার রোজগার না থাকলে ছোট ভাইয়ের পড়াও বন্ধহয়ে যাবে। দাদার চাকরির টাকায় সংসার চলে না।'

ঋত্বিকদার মুখটা কেমন থমথমে দেখালো। ইতিমধ্যে ভেতর থেকে জলখাবার আর চা এসেছে। বললেন, 'খেয়ে নে। শোন্ এক্ষুনি তোকে আমি কাজ দিতে পারছি না। তবু তুই আসবি। তোর আসা যাওয়ার খরচ দেবো। দরকার মত কিছু ছোট খাটো কাজ করবি। এতে আপত্তি নেই তো। তোর হাতের লেখা কেমন পড়ে বোঝা যায় তো।'

'বাড়ি থেকে পালিয়ে' ছবির শুটিংযে হাজির থাকতাম, টুকটাক এটা সেটা করতাম দরকারে। কিছু টাকাও হাতে পেতাম— এমনি করেই ইউনিটের একজন হয়ে গেলাম। ঋত্বিকদার কাছ থেকে অন্য কোথাও আর কাজ খুঁজতে যাই না, এমনি করেই মাসের পর মাস যায়।

'মেঘে ঢাকা তারা' ছবি করার প্রস্তুতি চলেছে। এবার ঋত্বিক ঘটকের সহকারী হওয়ার সুযোগ এলো। শুটিংয়ের সময় প্রায় সারাক্ষণই আমার গলায় ঝুলতো ভিসিওগ্রাফ'। এই 'ভিসিওগ্রাফ' দিয়ে কি লেন্স ব্যবহার সঠিক হবে পরিচালক বুঝে নিয়ে ক্যামেরাম্যান কে নির্দেশ দিতেন।

এটি আর কোন পরিচালককে ব্যবহার করতে আগে দেখিনি। পরে দেখেছি সত্যজিৎ রায়, রাজেন তরফদারকেও ব্যবহার করতে।

'মেঘে ঢাকা তারা'য় সহকারীর কাজে অনিল চাটার্জ্জিকে তানপুরা 'ছাড়া' শেখানো, আর গীতা দের পূর্ববঙ্গের ভাষার উচ্চারণ সঠিক করার মাষ্টারি করে বড় আনন্দ হতো।

'মেঘে ঢাকা তারা'র শুটিং পর্ব শেষ। আমার কাজও শেষ। আমি যে সময়ের কথা বলছি, তখন পরিচালকের প্রথম সহকারী ছাড়া, দ্বিতীয় বা তার বেশি সহকারী থাকলে শুটিং পর্ব শেষ হওয়ার পরে তাদের আর রাখা হতো না।

বেশ কয়েক দিন ষ্টুডিও বা ঋত্বিকদার বাড়ি যাইনি। শুটিং শেষে অবশ্য পুরো ছবির 'রাশ' দেখেছি কয়েবার। ফিল্ম ল্যাবোরেটারিতে একদিন যেতেই একেবারে ঋত্বিকদার মুখোমুখি।

কি ব্যাপার তোর বল্তো! রাশ এডিট হচ্ছে আসছিস না যে।

আমতা আমতা করে বলি। 'কাজ তো আর নেই। রোজ আসা যাওয়ার খরচ তো কম নয়।

'বুঝেছি, মাইনে পাবি না তাই। আচ্ছা তুই আমার কাছে আসার পর থেকেই তো আছিস। তোকে কি ছাড়িয়ে তাড়িয়ে দিয়েছি? মন দিয়েয় কাজটা শেখ না।'

আমি কি বলবো, একেবারে চুপচাপ।
ঋত্বিকদা বললেন, বাড়িতে যা। তোর বৌদির (সুরমা ঘটক) কায়ে গিয়ে বল। পঁচিশ তিরিশ যা হক তোকে দিতে। এডিটিং এ আসা চাই, নইলে গাঁট্টা খাবি।' --- এই বলে পকেট হাতড়ে বিড়ি বার করে ধরালেন। এই হলেন তিনি।
এ কথা তো ঠিকই, যে দিন থেকে তাঁর কাছে কাজের জন্য এসেছি, তারপর থেকে আমাকে কখনোই বসে থাকতে হয়নি। চিতরনাট্য লেখার কাজে ঋত্বিকদা মাঝে ম াঝেই আমাকে নিয়ে বসতেন। এ ছাড়াও আরো কিছু আমাকে লিখতে হতো।
চিত্রনাট্য লেখার প্রসঙ্গে জানাই, শু করার আগে তিনি চিত্রনাট্যের একটা কাঠামো তৈরী করতেন। তারপর সেটিকে অনুসরণ করে চিত্রনাট্যের দৃশ্য রচনা করতেন। কাগজ কলম নিয়ে তাঁর কাছে বসে এটা দেখেছি। দৃশ্যের বর্ননা ইংরেজিতে। সংলাপ বাংলায়। সংলাপ প্রায় অভিনয় করে বলতেন। এই ব্যাপারটা ভারি ভালো ল াগতো আমার।
আবার এর ব্যতিত্রম ও লক্ষ্য করেছি। 'কোমল গান্ধারে'র চিত্রনাট্য একলা বসেই তো লিখেছেন। মনে পড়ে 'মেঘে ঢাকা তারা'র শুটিং করতে করতে তাঁর মনে হয়েছে, মা আর নীতার একটি দৃশ্যের খুবই প্রয়োজন। যেখানে মেয়ে নীতার কাছে মা তার মনোভাব প্রকাশ করবে, নিজেকে মেলে ধরবে।
শুটিংয়েৰ একটা সাময়িক বিরতিতে ষ্টুডিওর একটা পুকুর ঘাটে বসে সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যটি রচনা করার পরেই তার দৃশ্য গ্রহণ করতেও দেখেছি।
লেখার জন্য কোন নির্দিষ্ট জায়গা বা সময় কোন কিছুরই দরকার হতো না ঋত্বিকদার।
মনে পড়ে, একদিন ঋত্বিকদা আমাকে বললেন, তুই তো হিন্দি জানিস না। জানলে তোকে বম্বে নিয়ে যেতাম।
আমি সোৎসাহে বলি, 'কিছুটা জানি'
'কিছুটা মানে।?'
লিখতে পড়তে পারি, বলতেও পারি। তবে গ্রামারের ব্যাপারটা বড় খটমট লাগে।'
'ডায়লগ পড়ে শোনাতে পারবি তো?'
আমি বললাম পারবো।...
ইংরেজিতে চিত্রনাট্য লেখা শু হলো। কাগজ কলম নিয়ে বসলাম। লেখার কাজ করার সময় সারাদিন ঋত্বিকদার বাড়িতেই থাকতাম। দুপুরের খাওয়া সেখানেই হতো।
লেখা শেষ হতে ঋত্বিকদা বম্বে চলে গেলেন। তাঁর সহকারী আমি আর উমাবাবু (নট ও নাট্যকার উমানাথ ভট্টাচার্য) আমাদের বম্বে রওনা হবার সব ঠিক। টিকিট কাটাও হয়ে গেছে। রওনা হওয়ার আগের দিন টেলিগ্রাম এলো রওনা না হতে। পরে জেনেছিলাম, ওখানকার প্রযোজকের অন্যায় আবদারের কাছে আপস করতে পারেন নি ঋত্বিকদা, তাই মোটা অঙ্কের চুক্তি পত্র বাতিল করে কলকাতা চলে এলেন।
কত কথাই তো মনে পড়ে। মাত্র তিন হাজার টাকা নিয়ে একটি পূর্ণ দৈর্ঘের ছবির পরিকল্পনার কথা। 'বগলার বঙ্গদর্শন' সম্পূর্ণ হয়নি। 'কত অজানারে' প্রায় শেষ হয়েও সেষ হয়নি। 'নক্শী কাঁথার মাঠ' এর চিত্ররূপ দিতে না পারার দুঃখ সইতে হয়েছে এক অসাধারণ প্রতিভাধর শিল্পীকে।...
চাকুলিয়া নামে রেল ষ্টেশনের কাছেই ছিল আমাদের থাকার জায়গা। 'সুবর্ণ রেখা' ছবির শুটিংয়ে ভোর হতেই বেরিয়ে যেতাম। একদিন ছিল ছোট অভিরাম আর সীতার রানওয়েতে ছোটাছুটির দৃশ্যের চিত্রগহণ। শাল মহুয়ার বনে ঘেরা একটা পরিত্যক্ত রানওয়ে। তার কাছাকাছি কিছু ভাঙা বাড়িঘর। যুদ্ধের সময় এই র ানওয়েতে ছোট ছোটো এরোপ্লেন প্রযোজনে হয়তো নামা ওঠা করতো। জায়গাটি খুবই নির্জন। হঠাৎ শালবন থেকে বিচিত্র পোষাক পরা, মুখে লাল কালো রং মাখা একটা লোক আমাদের সামনে মুখে একটা অদ্ভুত শব্দ করে হাতে খড়্গ নিয়ে লাফিয়ে পড়লো। সবাই যখন তাকে দূর দূর করতে যাচ্ছে, ঋত্বিকদা থামিয়ে দিয়ে লে াকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, এ্যাই কে তুমি? লোকটি বললো, আমি বহুরূপী।
এখানে কি চাই ?
পয়সা - কিছু দিন বাবুরা ।
ঋত্বিকদা বললেন, কাল ঠিক এই সময়ে এখানে এসো, পয়সা পাবে।
'সুবর্ণরেখা' যারা দেখেছেন, নিশ্চয়ই তাদের মনে আছে ছোট সীতা বহুরূপীকে দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে ছিলো। বহুরূপীকে সীতার সামনে এনে পরিচালক কি বোঝ াতে চেয়েছিলেন, সে কথা বলার প্রয়োজন নেই আমার। শুধু এটা জানাই, চিত্রনাট্যে কিন্তু এ সব ছিলো না। বহুরূপীকে দেখা মাত্র ভাবনাটা মাথায় এসেছে ঋত্বিকদ ার।
আর একদিন রেল ষ্টেশনে মা ও ছেলের একটা দৃশ্য শুটিং করতে গিয়ে ঋত্বিকদার নজরে পড়ে নির্জন ছোট ষ্টেশনের একধারে একটা বাচ্চা ছেলে একটা তারের দোলনায় দুলছে। ...একা, আনমনা, আশে পাশে কেউ নেই আর। ঋত্বিকদা ক্যামেরাম্যান দিলীপ মুখোপাধ্যায়কে বললেন, দিলীপ, তুই আগে ঐ বাচ্চাটার ছবি তে াল অন্তত চারশ ফিট। খুব সাবধান ও যেন টের না পায়। এই 'শট্টা' আমার খুব কাজে আসবে। দিলীপ তাই করলো।
ইউনিটের কেউ বুঝতে পারলো না এটি কোন কাজে লাগবে। কেননা, চিত্রনাট্যে এ ধরনের কোন উল্লেখ নেই।
অনেক পরে ঐ বাচ্চাটির দোল খাওয়া 'শট্টি' মৃত্যু দৃশ্যের পরে এডিট করে জুড়লেন ঋত্বিকদা। দর্শকদের নিশ্চয়ই এখনো মনে আছে।
...কত কথা কত ঘটনারই তো সাক্ষী আমি। আজ এতদিন...এত বছর পরে পূর্বাপর আর মনে আসেনি। যেমন মনে এসেছ, তাই লিখলাম।
পরিশেষে, ক'বছধর আগে ঋত্বিক ঘটকের সম্ভবত সব থেকে জনপ্রিয় 'মেঘে ঢাকা তারা' ছবি নিয়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিলো নন্দন প্রেক্ষ াগৃহে। ঋত্বিক অনুরাগী কয়েক'শ মানুষ সার বেঁধে আলোচনা সভায় যোগদিতে এসেছিলেন। আমিও ছিলাম। সেখানে বৌদির (সুরমা ঘটক) সঙ্গে অনেক দিন পরে দেখাও হয়েছিলো।
তথ্য - সংস্কৃতি মন্ত্রী মাননীয় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য ঋত্বিক ঘটক ও তাঁর শিল্পকর্ম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর সভাথেকে চলে গেলেন। সেখানে সঞ্চালক এমন কারে াকে চোখে পড়লো না। দর্শক দের নানা প্রশ্ন আর কৌতূহল নিবৃত্ত করার মত যোগ্য ব্যক্তিমঞ্চে ছিল না বলেই মনে হয়েছিলো আমার। সভার কাজ এলোমেলো ভ াবেই চলছিল। সইতে পারিনি বলে কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে এসেছিলাম। বেরিয়ে আসার আগে একবার ইচ্ছে হয়েছিলো মঞ্চের দিকে এগিয়ে যাই। বলি, আমি তঁ ার সহকারী ছিলাম। আমাকে বলুন ওঁর সম্পর্কে কি জানতে চান। সাধ্যমত আমি বলছি। কিন্তু সাহস হয়নি মঞ্চে ওঠার।
আজ, এতদিন পরে আন্তর্জাতিক ছোটগল্প পত্রিকার সম্পাদক ও সু-সাহিত্যক বন্ধুবর সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য আমাকে এই মহান চলচ্চিত্রকার সম্পর্কে কিছু লেখার সুযোগ করে দেওয়ায় যে সুযোগ আমি আর কারোর কাছ থেকে পাই নি, তাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com